চতুর্থ অধ্যায়

আখলাক

প্রিয় শিক্ষার্থী!

আমরা তো সারাদিন অনেক কাজ করি, তাই না? একটু চিন্তা করে দেখো তো গতকাল তুমি কি কি কাজ করেছ? তোমার গতকাল করা কাজগুলোর মধ্যে কোনগুলোকে তুমি ভালো কাজ হিসেবে চিহ্নিত করবে বলোতো? চিন্তা করে দেখো, গতকাল তোমার করা কাজগুলোর মাঝে এমন বিশেষ কোন কাজ আছে কিনা যেগুলোকে আমরা ভালো কাজ বলতে পারি। চিন্তা করে সেই কাজগুলো খাতায় লিখে ফেলো।

কাজ-১৩: তুমি গতকাল সারাদিন কি কি ভালো কাজ করেছ?

কাজ ১৩ হয়ে গেলে, তোমাদের শিক্ষক তোমাদের সবার করা ভালো কাজগুলো কি কি তা তোমাদেরকে জানাবেন। শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। বন্ধুরা গতকাল কি কি ভালো কাজ করেছে তা জানবে আর তুমি নিজেও সেইসব ভালো কাজগুলো করার চেষ্টা করবে।

আচ্ছা, আমরা কি সবসময়ই শুধু ভাল কাজ করি? কখনো কি এমন হয়ে যায় না যে, আমরা একটা কাজ করে ফেলেছি, যেটা হয়তো খুব ভালো কোনো কাজ হয়নি? আমরা হয়তো সবসময় জেনে বুঝে এমন কাজগুলো করি না, কিন্তু আমাদের দ্বারা এমন ছোট ছোট কিছু কাজ মাঝে মাঝে হয়ে যায়, তাই না?

চিন্তা করে দেখো, মাঝে মাঝে আমরা বাবা-মা এর প্রতি রাগ করে ফেলি, সময়মত পড়তে বসতে চাই না, ছোট ভাই-বোনদের বকা দিয়ে ফেলি, তাই না? এই কাজগুলো কিন্তু আসলে তেমন ভালো কোনো কাজ নয়। এখন আমরা এমন কিছু কাজ নিয়ে চিন্তা করব যেগুলো আমরা মাঝে মাঝে করে ফেললেও সেগুলো আসলে আমাদের করা উচিত নয়। তাহলে এখন তোমার কাজ হলো-

কাজ-১৪: গতকাল তুমি এমন কোনো কাজ করেছো যেটি ভালো কোনো কাজ হয়নি?

এই কাজটা যেকোনো ছোট বড় কাজ হতে পারে। চিন্তা করো এবং লিখে ফেলো। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এই কাজটির কারণে শিক্ষক তোমাকে শাস্তি দিবেন না, বরং কীভাবে তুমি ভবিষ্যতে এমন কাজ থেকে দূরে থাকতে পারো তা শিক্ষক তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।

আচ্ছা, সব বন্ধুরা কাজটি করে ফেললে শিক্ষক সেগুলো পড়ে দেখবেন এবং ভালো কাজ নয় এমন কয়েকটি কাজের উদাহরণ দিবেন। এরপর শিক্ষক তোমাদেরকে ইসলামি আখলাক বা চরিত্র সম্পর্কে জানাবেন।

আল-আখলাক

আখলাক (أَخْلَاقٌ) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ স্বভাব, চরিত্র, আচার ও ব্যবহার ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় আখলাক হচ্ছে মানব চরিত্র, ব্যক্তিগত স্বভাব, আচরণ এবং অন্য ব্যক্তি ও সমাজের সঙ্গে তার আচরণগত অভিব্যক্তি।

আখলাক দুই ধরনের; যথা– (ক) আখলাকে হামিদাহ বা উত্তম চরিত্র; (খ) আখলাকে যামিমাহ বা মন্দ চরিত্র।

আখলাকে হামিদাহ (اَلْأَخْلَاقُ الْحَمِيْدَةُ)

আখলাক অর্থ চরিত্র; আর হামিদাহ অর্থ প্রশংসনীয়। তাই আখলাকে হামিদাহ-এর অর্থ হলো প্রশংসনীয় চরিত্র। আখলাকে হামিদাহ-কে আবার আখলাকে হাসানাহ বা উত্তম চরিত্রও বলা হয়। মহান আল্লাহর পছন্দের ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসৃত উত্তম আচার-আচরণ বা স্বভাব-চরিত্র হলো আখলাকে হামিদাহ। মানুষের স্বভাব যখন সামগ্রিকভাবে সুন্দর, মার্জিত ও উত্তম হয়, তখন তাকে আখলাকে হামিদাহ বলে। সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, শালীনতা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, আমানতদারী, ক্ষমা, পরোপকার, বিনয়-নম্রতা ও সৃষ্টির সেবা ইত্যাদি আখলাকে হামিদাহ-এর অন্তর্ভুক্ত। এসব গুণের চর্চার মাধ্যমে মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। মহানবি (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন,

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

অর্থ: 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর।' (বুখারি)

আখলাকে হামিদাহ অর্জনে আমাদের করণীয়: এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা নিম্নরূপ:

- কথা, কাজ ও চিন্তায় সৎ হওয়া ও সততার নীতি অবলম্বন করা;
- অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা;
- আমানত রক্ষা করা;
- প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা;
- বিনয় ও নম্রভাবে চলাফেরা করা;
- ঝগড়া বিবাদ এড়িয়ে চলা;
- মিতব্যয়িতার পন্থা অবলম্বন করা;
- খারাপ সঙ্গ, পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে পরিহার করে চলা;
- উচ্চস্বরে বা কর্কশ ভাষায় কথা না বলা;
- সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে সততার ওপর অটল থাকা;
- কথা, কাজ ও চালচলনে শালীনতা বজায় রাখা ও অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকা; এবং
- কোনো যথাযথ কারণ ছাড়া পরিবেশ-প্রকৃতি ও প্রাণীর ক্ষতি সাধন থেকে বিরত থাকা।

আমরা এতক্ষণ আখলাকে হামিদাহ সম্পর্কে জানলাম। এবার এসো পাশের বন্ধুর সাথে মিলে নিচের কাজটি করে ফেলি।

জোড়ায় কাজ: উত্তম চরিত্র গঠন আমরা আর কি কি করতে পারি?

১।

২।

৩।

৪।

৫।

কতিপয় আখলাকে হামিদাহ

একজন পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে অবশ্যই মানুষকে আখলাকে হামিদাহ বা সুন্দর গুণাবলি অর্জন করতে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থী, চলো আমরা কতিপয় আখলাকে হামিদাহ বা উত্তম ও প্রশংসনীয় চরিত্র সম্পর্কে জেনে নিই।

সত্যবাদিতা (اَلصِّدْقُ)

সত্যবাদিতা মানব জীবনের অন্যতম সেরা গুণ। সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় আর মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে। সত্যবাদিতা আমাদেরকে জান্নাতের পথ দেখায়। সত্যবাদী লোককে সবাই ভালোবাসে। সত্যবাদিতাকে আরবিতে বলা হয় আস-সিদক (اَلصِّدْقُ)। সাধারণত যে ব্যক্তি সিদক বা সত্যবাদিতা চর্চা করে তাকে সাদিক (صَادِقٌ) বা সত্যবাদী বলা হয়। আমাদের জীবনে সত্যবাদিতার ভূমিকা অপরিসীম। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সব ক্ষেত্রে সত্যবাদিতার চর্চা করলে আমরা দুনিয়ায় শান্তি ও পরকালে মুক্তি পাবো। রাসুল (সা.) বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ إِلَى الْبِرِّ. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ

অর্থ: ‘তোমরা অবশ্যই সত্য কথা বলবে। কেননা সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতের পথ দেখায়।’ (মুসলিম)

সত্যবাদিতার উপকারিতা প্রসঙ্গে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন, ‘সত্য হলো প্রশান্তি এবং মিথ্যা হলো সংশয়।’ (আত-তিরমিযি) আমাদের প্রিয়নবি (সা.) ছিলেন সত্যবাদিতার মূর্ত প্রতীক। তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যবাদিতার চর্চা করে গেছেন। কোনো অবস্থায় তিনি মিথ্যা কথা বলেননি। বিশ্বসভ্যতায় তিনি সত্যের সুষ্ঠুধারা সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

অর্থ: 'সত্য সমাগত, মিথ্যা ধ্বংসপ্রাপ্ত; নিশ্চয়ই যা অসত্য-ভ্রান্ত, তার ধ্বংস অবধারিত।' (সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত: ৮১)

মহানবি (সা.) বলেছেন, 'সত্য বলো, যদিও তা তিক্ত হোক।' (বায়হাকি)

দলগত আলোচনা: সত্য কথা বলার সুফল

মাতাপিতার প্রতি সদাচার

মাতাপিতা আমাদের জীবনে আল্লাহর একটি বিশেষ নিয়ামত। দুনিয়াতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তাঁদের অগণিত অনুগ্রহ নিয়েই বেড়ে উঠি। বিশেষত জন্ম থেকে শুরু করে আমাদের শৈশবের প্রতিটি মুহূর্তে তাদের অনুগ্রহ ছাড়া আমাদের জীবন অচল। এ জন্য আনুগত্য, সদাচরণ ও ভালোবাসা পাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসুলের পরেই মাতাপিতার স্থান। এ মর্মে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

অর্থ: 'তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত করবে না এবং মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।' (সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত: ২৩)

মহান আল্লাহর এ বাণীর আলোকে মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা সন্তানের উপর ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। পক্ষান্তরে তাদের কোনোভাবে কষ্ট দেওয়া হারাম। মাতাপিতা আমাদেরকে তাঁদের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। আমাদের সুখ-শান্তির জন্য তাঁরা তাঁদের জীবনের সুখ-শান্তি বিলিয়ে দেন। আমরা যখন কোনো রোগ-শোকে আক্রান্ত হই, তখন তাঁদের দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না। এমনকি তাঁরা তখন আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে আমাদের আরোগ্য কামনায় ব্যাকুল থাকেন। আমাদের জীবনে তাঁদের অবদানের সঙ্গে অন্য কারও কোনো অবদানের তুলনাই হয় না। তাই মাতাপিতার নিকট আমরা চির ঋণী।

উপরে বর্ণিত আয়াত অনুসারে মাতাপিতা উভয়ের প্রতিই সদাচার করতে হবে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) মানুষের মধ্যে আমার নিকট সর্বোত্তম সেবা লাভের অধিকার কার? মুহাম্মাদ (সা.) বললেন, 'তোমার মায়ের। লোকটি পুনরায় জানতে চাইলেন, তারপর কার? তিনি বললেন, তোমার মায়ের। লোকটি পুনরায় জানতে চাইলেন, তারপর কার? তিনি বললেন, তোমার মায়ের। লোকটি আবারও জানতে চাইলেন, তারপর কার? তিনি বললেন, তোমার পিতার।' (বুখারি ও মুসলিম)। এ হাদিসে মায়ের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

কারণ গর্ভধারণের কষ্ট, সন্তান প্রসবের কষ্ট, জন্মের পর দুধ পান করানোর কষ্ট ছাড়াও আমাদের বেড়ে উঠার সময় মায়ের মায়া ও আত্মত্যাগ থাকে সীমাহীন। মহানবি (সা.) বলেন,

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ۔

অর্থ: 'জান্নাত তো মায়েদের পদতলে।' (নাসাঈ)

পবিত্র হাদিসে পিতার মর্যাদা প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) বলেন, 'আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে, আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।' (তিরমিযি)

আল-কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনার আলোকে মাতাপিতার প্রতি সদাচরণে আমাদের করণীয় হলো–

- তাদের সঙ্গে নম্র ও কোমল ভাষায় কথা বলতে হবে;
- তাদের প্রতি বিনয়ের সঙ্গে দয়াদ্র ও দায়িত্বশীল হতে হবে;
- তাদের সেবা-যত্ন করতে হবে;
- তাঁরা ডাকলে সাড়া দিতে হবে এবং তাঁদের কাছে উপস্থিত হতে হবে;
- নিজের জন্য দোয়া করার সময় তাঁদের জন্যও এভাবে দোয়া করতে হবে; 'হে আমার রব! তাঁদের দুজনার প্রতি অনুগ্রহ করুন, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন';
- তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার ও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে ইত্যাদি।

একক কাজ: তোমার মা-বাবার সঙ্গে তুমি প্রতিদিন কি কি ভালো কাজ করো এবং আরও কি কি করতে চাও তার তালিকা তৈরি করো।

আমি যা যা করি	আরও যা করতে চাই
১।	১।
২।	২।
৩।	৩।
৪।	৪।
৫।	৫।

আত্মীয়স্বজনের প্রতি সদাচার

আত্মীয় শব্দটি এসেছে আত্মা থেকে। আত্মীয় হলো আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ। আত্মীয়তা বলতে রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্ট আন্তরিক বন্ধনকে বোঝায়। আমাদের সবার উচিত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ও তাদের সঙ্গে সদাচার করা। আত্মীয়স্বজনরা আমাদের পরম আপনজন। আমাদের সুখ-দুঃখে তাঁরা দ্রুত এগিয়ে আসেন। তাঁরা প্রয়োজনে সুপরামর্শ ও নানা ত্যাগ স্বীকার করে বিপদ-আপদে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তাই মাতাপিতার হক আদায় করার পর আত্মীয়স্বজনের হক আদায় করা মুমিন হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন,

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى

অর্থ: 'মাতাপিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে এবং নিকটাত্মীয়দের সঙ্গেও ভালো ব্যবহার করবে।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৬)

আত্মীয়তার সম্পর্ককে সাধারণত: দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় এবং বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বড় অংশ আমাদের পিতৃকুলের এবং মাতৃকুলের। অর্থাৎ তাঁরা আমাদের মাতা ও পিতার খুবই নিকটজন ও আপনজন। যেমন– পিতৃকুলের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন আমাদের দাদা-দাদি, চাচা-চাচি, ফুফু-ফুপা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিগণ। আবার মাতৃকূলের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে রয়েছেন- নানা-নানী, মামা-মামী, খালা-খালু ও তাদের সন্তান-সন্ততিগণ। আমাদের ভাই-বোন এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততিগণও আমাদের নিকটাত্মীয়। আবার বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয় হলো স্ত্রী অথবা স্বামীর সকল রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজন। উভয় দিক থেকে সকল প্রকারের আত্মীয়স্বজন আমাদের উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিকার রাখেন। তাদের সবার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামি আদব। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ

অর্থ: 'তুমি তোমার আত্মীয়ের অধিকার আদায় করো।' (সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত: ২৬)

আত্মীয়স্বজনের প্রতি সদাচরণ ও সম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব

ইসলাম আত্মীয়স্বজনের প্রতি সদাচরণ ও সুসম্পর্ক রাখার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা আল্লাহর আদেশ পালনের অংশ। আল-কুরআনে একাধিক আয়াতে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সদাচার ও সম্পর্ক বাজয় রাখা প্রসঙ্গে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

অর্থ: 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (বুখারি ও মুসলিম)

অপর এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি রয়েছে মহান আল্লাহর রহমত সেখানে অবতীর্ণ হয় না।' (বায়হাকি)

আমাদের প্রিয়নবি (সা.) কেবল আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদাচরণ ও সুসম্পর্ক রাখার ব্যাপারে আদেশই প্রদান করেননি বরং ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এ ব্যাপারে চমৎকার আদর্শ স্থাপন করেছেন।

দলগত কাজ: আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে আমরা কি কি করতে পারি? একটি তালিকা তৈরি করো।

প্রতিবেশীর প্রতি সদাচার

প্রতিবেশীরা হচ্ছেন আমাদের নিকটজন। সাধারণত যাঁরা আমাদের অতি নিকটে বা পাশাপাশি বসবাস করেন, তাঁরাই আমাদের প্রতিবেশী। কত দূর– এলাকার অধিবাসীরা প্রতিবেশী হিসেবে গণ্য হবে, এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন– 'সামনে, পেছনে, ডানে ও বামে চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত সবাই প্রতিবেশী।'

প্রতিবেশীর প্রতি সদাচারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ জীবনে সুখ-শান্তির জন্য আমরা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এ জীবনে আমরা প্রতিবেশী ছাড়া চলতে পারি না। তাঁরা আমাদের ভালো-মন্দ খবরাখবর সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় বেশি জানেন। অনেক সময় আমাদের বিপদে আত্মীয়রা ছুটে আসার আগেই প্রতিবেশীরা আমাদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। তাই তাঁদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা ও সদাচারণ করা এবং তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য। প্রতিবেশী যে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র বা যে পর্যায়েরই হোক না কেন, সবার প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ করা আমাদের নৈতিক ও ইমানি দায়িত্ব।

প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ করার ব্যাপারে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। ইসলাম প্রতিবেশীর প্রতি সদাচার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রতি এত বেশি গুরুত্বারোপ করেছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'জিব্রাইল আমাকে সব সময় প্রতিবেশী সম্পর্কে অসিয়ত করে থাকেন। এমনকি আমার মনে হলো, হয়তো আল্লাহ তা'আলা প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন।' (বুখারি)

প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবেশীর দুঃখে ব্যথিত হওয়া এবং সুখে আনন্দিত হওয়া, প্রতিবেশী কোনো বিপদে পড়লে তার বিপদ মুক্তির জন্য চেষ্টা করা, প্রতিবেশী অভুক্ত থাকলে তাকে খাবার দেওয়া ইত্যাদি কাজ প্রকৃত মুমিনের পরিচায়ক। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন–

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهٗ جَائِعٌ إِلٰى جَنْبِهٖ

অর্থ: 'ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয়, যে পেট পুরে খায় আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।' (বুখারি)
প্রতিবেশীর সঙ্গে অসদাচরণ করা এবং তাদের কষ্ট দেওয়া ও তাঁদের নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা অনুচিত। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.) মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন, 'যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ বোধ করে না, সে ব্যক্তি ইমানদার নয়।' (বুখারি)

মাথা খাটিয়ে লিখি: যে সকল কাজ করে আমরা উত্তম প্রতিবেশী হিসেবে গণ্য হতে পারি–

১।
২।
৩।
৪।
৫।

বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ

বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা ও ছোটদের স্নেহ করা মানব চরিত্রের অন্যতম প্রশংসনীয় দিক। ছোটরা যেমন দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ দায়িত্বশীল নাগরিক, তেমনি বয়েজ্যেষ্ঠরা সমাজের স্তম্ভ। তাই ছোটদের যেমন স্নেহ, আদর-ভালোবাসা দিতে হবে, তেমনি বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এটি মহানবি (সা.) -এর শিক্ষা। প্রিয় শিক্ষার্থী, আজ আমরা বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান এবং ছোটদের স্নেহ করা সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা কী তা জানব।

ইসলাম বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান প্রদর্শন ও ছোটদের স্নেহ করার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। প্রিয়নবি মুহাম্মাদ (সা.) বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করতেন এবং ছোটদের স্নেহ ও আদর করতেন। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহের ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন। মহানবি (সা.) বলেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا

অর্থ: 'যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করে না সে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।' (তিরমিযি)

বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে সাক্ষাতে সালাম প্রদান করা, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, শালীনতা বজায় রেখে কথা বলা, কোন কাজ শুরুর আগে তাদের পরামর্শ নেওয়া, তাদের উপদেশ মেনে চলা, প্রয়োজনে তাদের কাজকর্মে সহযোগিতা করা ছোটদের নৈতিক দায়িত্ব। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'কোন বৃদ্ধকে যদি কোন যুবক বার্ধ্যক্যের কারণে শ্রদ্ধা করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ঐ যুবকের জন্য বৃদ্ধ অবস্থায় এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন যে তাকে শ্রদ্ধা করবে।' (তিরমিযি)

ছোটরা বসা থাকলে উঠে বয়োজ্যেষ্ঠদের বসার ব্যবস্থা করা এবং তাঁদের সম্মানে দাঁড়ানো রাসুলুল্লাহ (সা.) -এর সুন্নাত। মহানবি (সা.) সাহাবীগণকে বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মানে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণিত আছে যে, বনু কুরায়যার ফয়সালার বাপারে হযরত সা'আদ ইবনে মুয়ায যখন আগমন করলেন, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বনু কুরায়যাকে বললেন, 'তোমাদের সর্দারের আগমনে তোমরা দাঁড়িয়ে যাও।' (মুসলিম)

আমরা রাসুলের জীবনচরিত থেকে দেখতে পাই যে, তাঁর নিকট যখন কাফের সর্দাররা আসতো, তিনি তাদের যথোপযুক্ত সম্মান করতেন। তাদেরকে বসার জায়গা করে দিতেন, সম্মান দিয়ে কথা বলতেন। আবু জাহ্ল ছিলেন ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন। মহানবি (সা.)-কে ইসলাম প্রচারের কাজে সে বিভিন্নভাবে বাধা প্রদান করেছে। এমনকি রাসুলুল্লাহ (সা.) নামায আদায়ের জন্য যে রাস্তায় যাতায়াত করতেন, সেই রাস্তায় আবু জাহ্ল লোকজন দিয়ে বড় একটি গর্ত করে রাখে, যাতে মহানবি (সা.) রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় গর্তের মধ্যে পড়ে যান। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছায়, সেই গর্তে আবু জাহ্ল নিজেই পড়ে যায়। আর প্রিয়নবি (সা.) আবু জাহ্লকে ওই গর্ত থেকে উঠতে সাহায্য করেন। শুধু বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণেই মহানবি (সা.) তাকে এই সম্মান দেখিয়েছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, যে কোন পরিস্থিতিতে বয়োজ্যেষ্ঠকে অবশ্যই সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

ছোটদের স্নেহ করা মহানবি (সা.)-এর আদর্শ। তিনি ছোটদের খুব আদর করতেন। তাদের সঙ্গে কোমলভাবে মিশতেন, কখনও বা কৌতুক করতেন। শুধু নিজের ছেলেমেয়েই নয়, সব শিশুকেই তিনি সমানভাবে ভালোবাসতেন। ছোটদের প্রতি তাঁর আচরণ কিরূপ ছিল, তা নিচের ঘটনা থেকে বোঝা যাবে।

একবার আবিসিনিয়া থেকে একদল সাহাবী রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে মদিনায় আগমন করলেন। তাঁদের সাথে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও ছিল। মহানবি (সা.) ছোট ছেলেমেয়েদের সাথে একেবারে মিশে গেলেন। তাদের সাথে খেলাধুলা করলেন, এমনকি তাদের ভাষায় কথা বলে তাদেরকে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। এভাবে তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের মন জয় করলেন।

অন্য একদিনের ঘটনা। মহানবি (সা.) নামায পড়ছিলেন। সিজদারত অবস্থায় শিশু হাসান (রা.) ও হুসাইন (রা.) নানার পিঠের ওপর আরোহন করলেন। তাঁরা পিঠ থেকে না নামা পর্যন্ত মহানবি (সা.) সিজদাহ থেকে উঠলেন না। ফলে সিজদাহ দীর্ঘায়িত হলো। নামাজ শেষে মুসল্লিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আজ সিজদাহ বেশ দীর্ঘায়িত করলেন? তিনি জবাবে বললেন, আমার নাতিরা আমাকে সওয়ারি বানিয়েছে। তাই তাঁদের তাড়াতাড়ি পিঠ থেকে নামিয়ে দেয়াটা আমার পছন্দ হয়নি। (মুসনাদ আহমদ, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

একবার মহানবি (সা.) তাঁর দৌহিত্র শিশু হাসান ও হুসাইনকে চুমু দেন এবং পালক পুত্রের শিশু সন্তান উসামাহকেও চুমু দেন। এ দেখে এক গ্রাম্য লোক বলেছিল, আমার তো বারোটি সন্তান, অথচ কাউকে কখনো চুমু দিয়ে আদর করিনি। তখন মহানবি (সা.) বললেন- 'তোমার দিল থেকে আল্লাহ যদি রহমত উঠিয়ে নেন, তো আমার কি করার আছে।'

মহানবি (সা.) সবসময় শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতেন। অন্যদের তুলনায় তাদেরকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। ছোটদের আবদার রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। ইয়াতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষভাবে স্নেহ করতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সন্তান-সন্ততিকে স্নেহ করো এবং তাদের উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দাও' (ইবনে মাজাহ)। এছাড়াও তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের সাথে এমন আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তাদের মধ্যে আত্মসম্মান বোধ সৃষ্টি হয়।

ছোটদের ভালো কাজের মূল্যায়ন করা ও উৎসাহ প্রদান করা বয়োজ্যেষ্ঠদের কর্তব্য। এতে ছোটদের মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়। ভালো কাজের প্রতি আরো বেশি উৎসাহিত হয়।

ছোটদের প্রতি বয়োজ্যেষ্ঠদের করণীয় হলো-

- ছোটদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করা;
- তাদের সাথে কোমল আচরণ করা;
- তাদের সাথে খেলা-ধুলা ও কৌতুকে মেতে ওঠা;
- তাদের প্রতি কখনো বিরক্ত না হওয়া বা অতিরিক্ত রাগ প্রকাশ না করা;
- তাদেরকে উত্তম মানবীয় গুণাবলি শিক্ষা দেওয়া;
- তাদের কাজ ও মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া;

একক কাজ: তোমার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে তুমি প্রতিদিন কি কি উত্তম আচরণ করে থাকো এবং আরও কি কি করতে চাও তার তালিকা তৈরি করো।

আমি যা যা করি	আরও যা করতে চাই
১।	১।
২।	২।
৩।	৩।
৪।	৪।
৫।	৫।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সদাচার

ইসলাম সকল ধর্মের মানুষের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ ও মানবীয় আচরণের শিক্ষা দেয়। ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা ইসলামি শিষ্টাচার। আল্লাহ সকল মানুষকে সম্মানিত করেছেন। তাই মানুষ হিসেবে সবাই সমান। হাদিসে এসেছে, একদিন সাহল ইবনে হুনাইফ (রা.) ও কায়েস ইবনে সা'দ (রা.) কাদেসিয়া এলাকায় বসা ছিলেন। তখন তাঁদের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে কিছু লোক অতিক্রম করল। তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁদের বলা হলো, লাশটি অমুসলিমের। তাঁরা বললেন, মহানবি (সা.) এর পাশ দিয়ে একসময় একটি লাশ নেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হলো, এটা তো এক ইয়াহুদির লাশ। তখন তিনি বলেন, তিনি কি একটি প্রাণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না? (বুখারি)

সুখে-দুঃখে ভিন্ন ধর্মের মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাদের যে কোনো বিপদে-আপদে সাহায্য-সহযোগিতা করা ইসলামের শিক্ষা। মহানবি (সা.) যে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে বিভিন্ন ধর্মের লোক বসবাস করত। বিপদে-আপদে ও দুঃখে-কষ্টে মহানবি (সা.) সবার পাশে দাঁড়াতেন। এমনকি তিনি অমুসলিম রোগীকে দেখতে তাদের বাসায় যেতেন ও তাঁদের সেবা করতেন। সর্বদা তাদের অধিকারের সুরক্ষা দিতেন। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'জেনে রেখো! কোন মুসলিম যদি অমুসলিম নাগরিকের ওপর যুলুম নির্যাতন করে, অথবা তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে অথবা তার কোনো জিনিস বা সহায়-সম্পদ জোরপূর্বক কেড়ে নেয়; তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর বিচারের কাঠগড়ায় আমি তার বিপক্ষে, অমুসলিমদের পক্ষে বাদী হবো। (আবু দাউদ)। হযরত আসমা (রা.) বর্ণনা করেন, আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এলে আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কাছে জানতে চাইলাম– আমি কি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব? রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তুমি তাঁর সঙ্গে মায়ের মতোই আচরণ করবে।' (বুখারি)

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। এজন্য ইসলাম উদারভাবে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ নির্বিশেষে সকলের কল্যাণ সাধনের নির্দেশ দিয়েছে। তাই ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের প্রতিও মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের প্রতি মুসলিমরা যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে তা হলো–

- ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ ধর্ম পালন ও উৎসবে বাধা প্রদান করবে না;
- তাদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলবে ও সুন্দর আচরণ করবে;
- ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের উপর জোর প্রয়োগ করা যাবে না;
- সকল ধর্মের মানুষের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা ও সেবার আদান-প্রদান করতে বাধা নেই;
- ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জান-মালের নিরাপত্তা দিতে হবে;
- ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কোনোও আত্মীয়স্বজন থাকলে তার সঙ্গে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে হবে; এবং
- ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশীদের যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করতে হবে, তাদের দুঃখে-কষ্টে পাশে দাঁড়াতে হবে।

বাড়ির কাজ: ভিন্ন ধর্মের অনুসারী বন্ধু বা প্রতিবেশীর সঙ্গে তোমার ভালো সম্পর্কের বিষয়ে একটি গল্প লেখো।

সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সদাচার

ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, আরব-অনারব, সাদা-কালো, ধনী-গরীব সকল ভেদাভেদ ভুলে সকলের সাথে মানবীয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছে। মানুষ হিসেবে সকলকে সম্মান প্রদর্শন করে সমাজে শান্তিপূর্ণ সহবস্থান নিশ্চিত করেছে। মহানবি (সা.) সকল সৃষ্টি জীবের কল্যাণের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'আমি তো আপনাকে জগৎসমূহের রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।' (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭) তাই সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ মিলেমিশে একত্রে সমাজে বসবাস করা ও সমস্ত সৃষ্টিজীবের কল্যাণ সাধন করা মানুষের দায়িত্ব।

ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা বাবা আদম (আ.) ও মা হাওয়া (আ.) থেকেই সকল মানব সন্তানকে সৃষ্টি করেছেন। কুরআন মাজিদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى

অর্থ: 'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে।' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩)

অতএব সমগ্র মানবজাতি একটি পরিবার। মহানবি (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন,

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ

অর্থ: 'সমস্ত সৃষ্টি জগত আল্লাহর পরিবার স্বরূপ। সুতরাং সৃষ্টি জগতের মধ্যে সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় যে আল্লাহর পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে।' (বায়হাকী)

সুতরাং সকল মানুষ ও মহান আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টিজীব এ বৃহৎ পরিবারের সদস্য। পরিবারের সবাই মিলেমিশে শান্তিপূর্ণভাবে সমাজে বসবাস করবে- এটাই ইসলামের শিক্ষা। তাই আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, উঁচু-নিচু, ধনী-গরীব প্রভৃতি ভেদাভেদ ভুলে একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করব, অপরের বিপদে এগিয়ে আসব, সবার সাথে উত্তম ব্যবহার করব। মহানবি (সা.) মদীনা সনদে উল্লেখ করেন, প্রতিবেশীকে নিজের মতই গণ্য করতে হবে। তার কোন ক্ষতি বা তার প্রতি কোন অপরাধ সংঘটন করা যাবে না। মদীনার কেউ বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তা প্রতিহত করা হবে। মজলুমকে সবাই সাহায্য করবে। এর ফলে মদীনায় বসবাসরত সকল ধর্ম, গোত্র ও সম্প্রদায়ের নাগরিকরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে ও সকল বিপদে আপদে পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসে।

ইসলামের প্রথম খলিফা ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। তাঁর শাসনামলে ভিন্নধর্মাবলম্বী কোনো ব্যক্তি অসুস্থ বা বৃদ্ধ হয়ে কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে তিনি তার বার্ষিক 'কর' মওকুফ করে দিতেন এবং বায়তুল মাল থেকে তার ও তার পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে দিতেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) ও অন্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি একবার এক গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে এক অসহায় বৃদ্ধ তাঁর পেছন থেকে ধরে বসল। ওমর (রা.) বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, কী দরকার? বৃদ্ধ বললেন, কর মওকুফ, কিছু সাহায্য ও বার্ধক্য ভাতা। ওমর (রা.) তাকে সর্বপ্রথম নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য ও সাহায্য প্রদান করলেন। এরপর বায়তুল মালের হিসাবরক্ষকের কাছে তাকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, এ বৃদ্ধ এবং তার মতো আরও যত বৃদ্ধ আমাদের দেশে আছে, সবার কর মওকুফ করে দাও এবং খাদ্যভাণ্ডার থেকে তাদের সাহায্য করো। এমন ব্যবহার কিছুতেই সমীচীন নয় যে, আমরা তাদের যৌবনে শুল্ক গ্রহণ করে বার্ধক্যে তাদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেব। বৃদ্ধ লোকটি ছিলো ইয়াহুদি ধর্মের অনুসারী। (ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ)

উপরোক্ত ঘটনার আলোকে আমাদের চারপাশে যে সকল অমুসলিম রয়েছে তাদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে তুলতে হবে। একইসাথে সকল অমুসলিমদের সাথে উত্তম আচরণ ও সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে।

পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা ও সংরক্ষণ

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তার সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। এ সবই আল্লাহর দান। পবিত্র কুরআন শরিফে বলা হয়েছে, 'আর পৃথিবী, তাকে আমি বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি; এবং আমি তাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্‌গত করেছি সুপরিমিতভাবে, আর তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য, আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও তাদের জন্যও। আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমি তা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি। আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করতে দিই; আর তোমরা তার ভাণ্ডার রক্ষক নও।' (সূরা আল-হিজর, আয়াত: ১৯-২২)

পরিবেশের ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করা হলে এর ভারসাম্য নষ্ট হয়। ইসলাম মানুষের সুস্থতাকে উন্নত পরিবেশের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে চায়। সেজন্য ইসলাম পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে বদ্ধপরিকর। নোংরা ও দূষিত পরিবেশ রোগব্যাধির প্রধান কারণ। তাই যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা, কফ, থুথু ও মলত্যাগ করা যাবে না। প্রকৃতিকে তার নিয়মানুযায়ী চলতে দেওয়া দরকার। তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষা ও দূষণ প্রতিরোধে সবার দায়িত্ব পালন করা দরকার। যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ একদিকে যেমন পরিবেশ দূষণ হয় অন্যদিকে এটি রুচিহীন কাজ। তাই মানুষের সুস্থ থাকার জন্য পরিবেশকে যথাযথ ও দূষণমুক্ত রাখার প্রতি ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। প্রিয়নবি (সা.) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের আঙ্গিনাকে পরিচ্ছন্ন রাখো।' পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তিনি ঘোষণা করেন, 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ।' (মুসলিম) অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে, 'তোমরা তিনটি অভিসম্পাতপূর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকো; যাওয়া-আসার স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা, রাস্তার মধ্যস্থলে মলমূত্র ত্যাগ করা এবং গাছের ছায়ায় মলমূত্র ত্যাগ করা।' (আবু দাউদ)

সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য চাই সুস্থ, সুন্দর ও মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ। পরিবেশের ভারসাম্য ও সংরক্ষণের জন্য বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন জরুরি। পরিবেশের ভারসাম্য ও তাপমাত্রা কমানোর জন্য বনাঞ্চল ও গাছপালা অতীব প্রয়োজনীয়। পরিবেশের ক্ষতি করে এমন যেকোনো কাজ করতে ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়, বিনাশ অথবা অপরিমিত ব্যবহার কোনোটিই ইসলামের দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য নয়। পরিবেশ ধ্বংসের যেকোনো ধরনের কাজ আল্লাহ প্রদত্ত সেবা থেকে বঞ্চিত করার শামিল। মহানবি (সা.) পরিবেশ রক্ষায় গাছ কাটতে নিষেধ করেছেন। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যদি তুমি বুঝতেও পারো যে, কিয়ামত (মহাধ্বংস) আসছে এবং তোমার হাতে একটি গাছের চারা থাকে, তবুও তুমি চারাটা লাগিয়ে দাও।' (মুসনাদ আহমদ) অন্য হাদিসে প্রিয়নবি (সা.) বলেন, 'গাছ লাগানো মুসলিমদের জন্য সাদকাস্বরূপ।' (বুখারি) মহানবি (সা.) আরও বলেছেন, 'যদি কেউ গাছ লাগিয়ে মারাও যায় কিন্তু গাছ যদি বেঁচে থাকে এবং তার ফল ও ছায়া মানুষ ও পশু-পাখি যত দিন ভোগ করবে, ততদিন মৃত ব্যক্তি নেকি পেতে থাকবে।' (মুসনাদ আহমদ) অন্যত্র এক হাদিসে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি গাছ লাগায় এবং গাছের যত্ন করে তাকে বড় করে, সেই গাছের একটি ফলের হিসাবে তার আমলনামায় একটি করে নেকি লেখা হয়।' (মুসনাদ আহমদ)

নদীর পানি দূষিত করা, পাহাড় কাটা, বদ্ধ পানিতে বর্জ্য-ময়লা ফেলা, শিল্প-কারখানার ধোঁয়া, কার্বন নিঃসরণ ইত্যাদি পরিবেশ বিপর্যয়কারী বিষয় থেকে বিশ্বের সকল মানুষের বিরত থাকতে হবে। আমাদের প্রিয় স্বদেশকে পরিবেশবান্ধব রাখবো। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টিজীবের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

পরিবেশ সংরক্ষণে করণীয় কিছু বিষয়–

- প্রকৃতি ও পরিবেশের ক্ষতি করে এমন যেকোনো কাজ থেকে বিরত থাকা;
- ময়লা-আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা;
- গাছ কাটার প্রবণতা কমিয়ে বেশি বেশি গাছ লাগানো;
- কলকারখানার বর্জ্য ও রাসয়নিক পদার্থ পরিবেশে ফেলার আগে পরিশোধন করা;
- উচ্চ শব্দ নিয়ন্ত্রণ;
- পলিথিনের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ;
- পানিতে কীটনাশক, ক্ষতিকারক বর্জ্য ও পয়ঃবর্জ্য ফেলা বন্ধ করতে হবে; এবং
- পরিকল্পিত নগরায়ণ।

সম্মিলিত কাজ: ষষ্ঠ শ্রেণির সকল বন্ধু মিলে তোমাদের শ্রেণিকক্ষ এবং এর আশপাশের এলাকা পরিষ্কার করো।

আখলাকে যামিমাহ (اَلْاَخْلَاقُ الذَّمِيْمَةُ)

আখলাকে যামিমাহ অর্থ নিন্দনীয় চরিত্র। আখলাকে যামিমাহ বলতে মানুষের মন্দ আচরণ যেমন– মিথ্যা বলা, প্রতারণা, ধোঁকা, ঈর্ষা, হিংসা, লোভ, গিবত, গালি ও মন্দ কথা, অশ্লীলতা, অপচয়, অহংকার, ক্ষতিকর আসক্তি ইত্যাদিকে বোঝায়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'দুষ্ট ও কঠোর স্বভাবের ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (আবু দাউদ)

আখলাকে যামিমাহ আত্মিক ও মানসিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন করে। যার মধ্যে মন্দ আচরণ বিদ্যমান সে সকলের কাছে ঘৃণিত। এরা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে থাকে। একজন পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে গেলে অবশ্যই মানুষকে আখলাকে যামিমাহ বর্জন করতে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থী, চলো আমরা কতিপয় আখলাকে যামিমাহ বা নিন্দনীয় চরিত্র সম্পর্কে জেনে নেই।

মিথ্যা

যা সত্য নয় তা-ই মিথ্যা। কথা ও কাজে জেনেশুনে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা একটি মন্দ আচরণ। মিথ্যাকে সকল পাপ কাজের জননী বলা হয়। একটি মিথ্যা থেকে অসংখ্য মিথ্যার জন্ম হয়। তাই কোনভাবেই মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। কেননা, বিক্রি করার সময় মিথ্যা বলা, ওজনে কম দেওয়া কিংবা ভেজাল দেওয়াসহ নানা রকম প্রতারণা করা উচিত নয়। এমনকি হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমেও মিথ্যা বলা যাবে না।

মিথ্যার পরিণাম

মিথ্যা একটি জঘন্য অপরাধ। এটি একটি কবিরা গুনাহ বা মহাপাপ। মিথ্যা সকল পাপের মূল। প্রতারণা, প্রবঞ্চণা ও অন্যের সম্পদ আত্মসাতসহ সকল অনৈতিক ও সমাজবিরোধী কর্মের মূলে রয়েছে মিথ্যাচার। যে সমাজে মিথ্যাচার বৃদ্ধি পায়, সে সমাজ ক্রমে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়।

মিথ্যাচার একটি নিন্দনীয় আচরণ। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না এবং ভালোবাসে না। বিপদের সময় তাকে কেউ সাহায্য করতে আসে না। তার কথাকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। মহান আল্লাহ তা'আলা তার উপর খুব অসন্তুষ্ট হন। মহান আল্লাহ বলেন: 'আর তোমরা দূরে থাক মিথ্যা কথন থেকে।' (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩০)

পবিত্র কোরআনে বহু আয়াতে নানাবিধ মন্দ কাজ নিষেধ করা হয়েছে।

মহানবি (সা.) বলেন, 'তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাকবে। কেননা, মিথ্যা পাপাচার পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আর পাপাচার জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। ব্যক্তি যখন অনবরত মিথ্যা বলতে থাকে তখন আল্লাহর নিকট তাকে মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়।' (বুখারি ও মুসলিম)

মিথ্যা কথা বলা মুনাফিকের নিদর্শনও বটে। হাদিসে বলা হয়েছে,

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ

অর্থ: 'মুনাফিকের আলামত তিনটি– যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, আমানতের খেয়ানত করে এবং ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে।' (বুখারি ও মুসলিম)
অতএব, মিথ্যা সর্বদা পরিত্যাজ্য। আমারা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, সহপাঠী, বন্ধু-বান্ধব কারো সাথেই মিথ্যা বলব না।

প্রতারণা

প্রতারণা হচ্ছে অসদুপায় অবলম্বন করে কোনো কিছু পাওয়ার চেষ্টা করা। প্রচলিত আইন বা নিয়ম-কানুনকে উপেক্ষা করে কিংবা ফাঁকি দিয়ে অসৎ উপায়ে কোনো কিছু অর্জন করাকে প্রতারণা বলে। আমাদের সমাজে বিভিন্ন রকমের প্রতারণামূলক কাজ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন– বিশ্বাস ভঙ্গ করা, মিথ্যা শপথ করা, ওজনে কম দেওয়া, পণ্য বিক্রিতে দোষ গোপন করা, পণ্যে ভেজাল দেওয়া, দেশে-বিদেশে চাকরি দেওয়ার মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া, অন্যের হক নষ্ট করা, অফিস-আদালত ও লেনদেনে দুর্নীতি করা এবং পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করা ইত্যাদি।

প্রতারণার কুফল

প্রতারণা একটি জঘন্য সামাজিক অপরাধ। প্রতারণার জন্য মানুষকে বিভিন্ন রকমের দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তি ভোগ করতে হয়। প্রতারণা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সত্যিকার ইমানদার কখনোই প্রতারণার আশ্রয় নেয় না, মানুষকে ধোঁকা দেয় না এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।

প্রতারণার কুফল সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ - اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ -
وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ

অর্থ: 'দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকদের থেকে মেপে নেবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে কিন্তু অন্যকে মেপে ও ওজন করে দেওয়ার সময় কম দেয়।' (সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত: ১-৩)

আমাদের সমাজে নানারকম প্রতারণা দেখতে পাওয়া যায়। যে রূপেই প্রতারণা করা হোক না কেন, ইসলাম সেটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। লেনদেন ও বেচাকেনা কিংবা ওজনে কম দেওয়ার বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অসংখ্য হাদিস পাওয়া যায়। মহানবি (সা.) একবার বাজারে খেজুরের দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তার অভ্যন্তরে ভেজা খেজুর পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে খাদ্যের মালিক! এটি কী? জবাবে সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, বৃষ্টির কারণে ভিজে গেছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'তুমি খেজুরগুলো উপরে রাখলে না কেন? তাহলে তো ক্রেতাগণ এর অবস্থা দেখতে পেত (প্রতারিত হতো না)। যে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হবে না।' (মুসলিম)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, জীবনের কোন কাজেই প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। প্রতারণা একটি অপরাধ। একবার যদি কেউ প্রতারণা করে তবে তাকে কেউ আর বিশ্বাস করে না। একবার বিশ্বাস ভঙ্গ হলে আর কোনোভাবেই সে বিশ্বাস তৈরি করা যায় না। প্রতারণা করে আপাতদৃষ্টিতে কিছু অর্জন করতে পারলেও তার সার্বিক ফল ভালো হয় না। একজন মুসলমান কখনই অন্য কাউকে ধোঁকা দিতে পারে না। তাইতো ধোঁকা ও প্রতারণামুক্ত সমাজ গড়তে আমাদের সকলকে ইমানি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে।

গিবত বা পরনিন্দা

গিবত একটি সামাজিক অনাচার। কারও অগোচরে তার দোষ-ত্রুটি অন্যের কাছে প্রকাশ করাকে গিবত বলে। একে পরনিন্দাও বলা হয়। গিবত একটি ঘৃণিত ও জঘন্য কাজ। এটি কবিরা গুনাহ। এ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'গিবত কী তা কি তোমরা জানো?' লোকেরা উত্তরে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন । রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'গিবত হলো তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে তার অগোচরে তোমার এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে। জিজ্ঞাসা করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, এটাও কি গিবত হবে?'

রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই গিবত হবে। আর তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে তা হবে অপবাদ।' (মুসলিম) গিবত একটি নিন্দনীয় কাজ। গিবতের মাধ্যমে মানুষে মানুষে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে সমাজ জীবনে ঝগড়া-ফাসাদসহ নানা অশান্তি সৃষ্টি হয়। পবিত্র কুরআনুল কারীমে গিবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ

অর্থ: 'তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে, নিশ্চয়ই তা তোমরা অপছন্দ করবে।' (সূরা আল- হুজুরাত, আয়াত: ১২)
গিবত করার মতো গিবত শোনাও পাপের কাজ। কেউ গিবত করলে তাকে গিবত থেকে বিরত রাখা কর্তব্য। তাহলে গিবতচর্চা সমাজ থেকে দূরীভূত হবে।

সর্বাবস্থায়ই গিবত বা পরনিন্দা থেকে মুক্ত হতে হবে। কারণ, কোনও অবস্থায়ই গিবত জায়েজ বা বৈধ নয়। কেউ যদি গিবত করে তবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যার গিবত করা হয়েছে তার থেকে অবশ্যই মাফ করিয়ে নিতে হবে। আর সে যদি মারা যায়, তার থেকে ক্ষমা চাওয়া সম্ভব না হয়, তবে আল্লাহর নিকট তার গুনাহ মাফের দোয়া করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'নিঃসন্দেহে গিবতের একটি ক্ষতিপূরণ হলো, তুমি যার গিবত বা কুৎসা রটনা করেছ তার জন্য এভাবে দোয়া করবে: হে আল্লাহ তুমি আমার ও তার গুনাহ মাফ করে দাও।'

গিবত বা পরনিন্দা ইমান ও আমল ধ্বংস করে দেয়। মানুষের মধ্যে একতা নষ্ট হয়, অন্যের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস তৈরি হয়। পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতি নষ্ট হয়। ফলে সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। যে গিবত করে তার ভালো আমলগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তাইতো সর্বদা গিবত বা পরনিন্দা থেকে দূরে থাকতে হবে। সমাজ থেকে গিবত দূর করতে আমাদের সকলকে একত্র হয়ে কাজ করতে হবে। না হয় সংক্রামক ব্যাধির মতো সমাজে গিবত বৃদ্ধি পাবে। তা সমাজের জন্য মহা অমঙ্গলের কারণ হবে।

গালি ও মন্দ কথা

কাউকে মন্দ নামে ডাকা, মন্দ কথা বলা, তিরস্কার করা, অশালীন বা অশ্লীল কথা বলা হলো গালি দেওয়া। এটি একটি নিন্দনীয় কাজ। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ

অর্থ: 'ইমান আনয়নের পর মন্দ নামে ডাকা অতিশয় গর্হিত কাজ।' (সূরা আল হুজুরাত, আয়াত: ১১)

মানুষ সভ্য জাতি, তারা কাউকে গালি দেবে না। সমাজে একত্রে বসবাস করতে হলে পরস্পরের সঙ্গে মতের অমিল থাকতে পারে। একে অপরের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিও হতে পারে। একের সঙ্গে অন্যের কথা কাটাকাটি হতে পারে। তা সত্ত্বেও একে অন্যকে অশালীন বা অশ্লীল কথা বলে গালি দেওয়া উচিত নয়। অশালীন কথা বলা নিতান্তই খারাপ কাজ। যে গালি দেয় ও অশালীন কথা বলে, সে সমাজে ঘৃণিত। তাকে মানুষ পছন্দ করে না। সমাজে তার কোনো সমাদর থাকে না। তার সঙ্গে কেউ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে না। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) গালি দিতে বা গালাগাল করতে নিষেধ করেছেন।

একবার মহানবি (সা.) কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে আমার সম্প্রদায়ের এমন এক ব্যক্তি গালি দেয়, যে আমার থেকে নিচু। এর প্রতিশোধ নিতে আমার কোনো বাধা আছে কি? রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন, 'পরস্পর গালমন্দকারী উভয়েই শয়তান। তারা পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলে এবং একে অপরকে দোষারোপ করে।' (বুখারি ও মুসলিম)

গালি সম্পর্কে আরও বলেছেন, মাতাপিতাকে গালি দেওয়া মহাপাপ। সাহাবিগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এমন কোনো নরাধম আছে যে আপন মাতাপিতাকে গালি দেয়?' তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি অপরের মাতাপিতাকে গালি দেয় এবং এজন্য সে-ও তার মাতাপিতাকে গালি দেয়।' (বুখারি ও মুসলিম)

এ হাদিস শরিফ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, অন্যের মাতাপিতাকে গালি দেওয়া মানে নিজের মাতাপিতাকে গালি শোনানো। সমাজকে গালিমুক্ত করতে গালির উত্তরে গালি দেবো না, এতে গালমন্দকারী লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে। গালমন্দ ভালো কাজ নয়, গালমন্দের মতো অশালীন কাজ হতে আমরা বিরত থাকব।

গল্প বলার আসর

প্রিয় শিক্ষার্থী,

অনেক তো ভালো কাজ আর মন্দ কাজ সম্পর্কে জানা হলো। এবার তাহলে একটা আনন্দের কাজ করা যাক। এসো এবারে বন্ধুরা মিলে একটি গল্প বলার আসরের আয়োজন করি।

ক্লাসের বন্ধুরা মিলে এবার একটি গল্প বলার আসরের আয়োজন করবে। সেখানে তোমরা এতদিন যেসকল আখলাকে হামিদাহ আর আখলাকে যামিমাহা এর ব্যাপারে জেনেছ সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবে। তুমি বা তোমার পরিচিত কেউ কিভাবে প্রতিদিন আখলাকে হামিদাহা এর চর্চা করেছে তার গল্প বলবে। আখলাকে যামিমাহ গুলো থেকে দূরে থাকতে তুমি কি কি কাজ করছ, অন্যকে কিভাবে সহায়তা করছ সেই গল্প বলবে। আর বন্ধুদের গল্পগুলোও শুনবে। ব্যাস, এটাই কাজ।

তোমাদের ইসলাম শিক্ষা বিষয়ক শ্রেণির কাজের সময় থেকে একটা দিন ঠিক করে নিয়ে সেদিন তোমরা এই গল্প বলার কাজগুলো করবে। নিজেরা গল্প বলবে, অন্যের গল্প শুনবে। শিক্ষকও তোমাদের সাথে গল্প বলার কাজে অংশগ্রহণ করবেন।